মাসিক

জীবনবাতি

মাইজভাণ্ডারী তরিকা ও দর্শন বিষয়ক পত্রিকা

১৪১৯- ভাদ্র ১৪২০ | র্চ- সেপ্টেম্বর ১৩ | রবিউস সানি - শাওয়াল ১৪৩৪ হিজরী

জীবনবাতির কলমে

উপমহাদেশে তরিকত চর্চার ক্ষেত্রে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের ভূমিকা এবং গুরুত্ব আজ বিশ্বের সুফী ধারায় অনুসন্ধিৎসুদের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও সম্মানজনক একটি অবস্থান তৈরী করতে সমর্থ হয়েছে। এই মহান অধ্যাত্ম মিলন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও বেলায়তে মোতলাকা-এ-আহমদি যুগের প্রবর্তক গাউসুলআজম এখতেতামিয়া মাওলানা শাহ্সূফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) [১৮২৬-১৯০৬] জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানবের কল্যাণে পবিত্র কোরআনেপাকের হেদায়তের আলোকে উসূলে সাব'আ বা সপ্তপদ্ধতির চর্চা ও ফলব জারীর লক্ষ্যে প্রবহমান ধারায় জিকির অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে 'মাইজভাণ্ডারী তরিকা' প্রতিষ্ঠা করেন। মাইজভাণ্ডার দরবার দরবার শরীফের মাটিতে গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারীর উসূল এবং আদর্শকে ধারণপূর্বক খলিফায়ে আজম, কুতুবুল আকতাব ইউসুফে সানী গাউসুলআজম বিলবেরাছত মাওলানা শাহ্সূফী সৈয়দ গোলাম রহমান (ক.) [১৮৬৫-১৯৩৭] এর কামালিয়তে লালিত হয়ে এবং অপরাপর খোলাফায়ে গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারীর বেলায়তী পরিচয়ে গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারী তরিকা সম্প্রচারিত ও সম্প্রসারিত হয়ে বিশ্বের সুফী গবেষকদের আগ্রহকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছে। বর্তমান সময়ে আওলাদে মাইজভাণ্ডারীসহ এই মহান দরবারে পাকে বাইরে অবস্থিত খোলাফায়ে গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারীর কামালিয়তের বরকতে প্রতিষ্ঠিত দরবার সমূহের সমন্বিত ও সম্মিলিত প্রয়াস দেশের ধর্মীয় অধ্যাত্মসহ সামাজিক সংকট নিরসনে কার্যকর ভূমিকা পালনের সামর্থ সংরক্ষণ করে নিঃসন্দেহে।

বলাই বাহুল্য মাইজভাণ্ডারী তরিকা ও দর্শনের কল্যাণকামীতাকে ধারণ ও লালনে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্মোহ ও ত্যাগী মনোভাবে এগিয়ে আসতে হবে। ইতিহাস কখনোই কপটতা ও বিভ্রান্তিকে লালন করেনি এবং করবেও না। তাই 'আপনারে যে বড় বলে বড় সে নয়, লোকে যারে বড় সেই হয়।' এই অমোঘ বাণীর বাস্তবতায় ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিত্যাগ করে গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারীর প্রবর্তিত তরিকার ভিত্তিতে অভিন্ন চেতনায় মাইজভাণ্ডারী দর্শনের সঠিক চর্চায় শুধু ব্যক্তি নয়, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সহ সমগ্র বিশ্বের মানবতার কল্যাণে এই দর্শন স্বীয় যুগোপযোগীতাকে অব্যহতভাবে প্রমাণে সমর্থ থাকবে ইন্শাআল্লাহ্।

বিগত মাঘ সংখ্যা প্রকাশের পর বিভিন্ন কারণে জীবনবাতি পাঠকদের কাছে পৌছানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বর্তমানে পূর্বের স্থবিরতা কাটিয়ে নবতর ব্যবস্থাপনায় মাইজভাণ্ডারী তরিকা ও দর্শন বিষয়ক পত্রিকা জীবনবাতি প্রতিমাসে 'পাঠকদের জন্য উপস্থাপনে আমরা সর্বদা সচেষ্ট থাকবো। পাঠক গ্রাহকদের যে আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা আমরা ইতোমধ্যে উপলব্ধি করেছি আশাকরি আগামীর সময়ে এই অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি থেকে পাঠক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদেরকে মুক্ত রাখতে সমর্থ হবো ইন্শাআল্লাহ্। নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে জীবনবাতির প্রকাশনায় অনাকাঙ্খিত ও অবাঞ্ছিত এই পরিস্থিতির জন্য সম্পাদনা ও পরিচালনা পরিষদের পক্ষ থেকে পাঠকদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। গাউছে পাক-এর ফয়জ বরকত সরকারে দো'আলম এর নেগাহে করমে মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলের সহায় থাকুন।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

ও তাঁর প্রিয়তম রাসুলের মধ্যে প্রতিনিধি স্বরূপ। তিনি পবিত্র কোরআন নিয়ে আসতেন নবীজির দরবারে। কিন্তু তিনি এর প্রকৃত মর্মার্থ ও রহসাবলী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। যেমন তাফসীরে রুহুল বায়ানে কাফ, হা, ইয়া, আইন, ছ-দ এর ব্যাখায় উল্লেখিত আছে যে সায়্যিদুনা জিব্রাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আগমন করে আরজ করলেন 'কাফ' জবাবে নবীজি বললেন- আমি বুঝেছি অতঃপর জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, হা রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- আমি বুঝে ফেলেছি। আবার জিব্রাঈল আলাইহি বললেন; ইয়া। আল্লাহর হাবীব বললেন-আমি বুঝেছি । আবার জিব্রাঈল আলাইহি বললেন আইন। আল্লাহর প্রিয় মাহবুব বললেন আমি অবগত আছি । জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বললেন ছ-দ । নুরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এ সর্ম্পকে আমি ওয়াকিবহাল। মহানবীর এরূপ প্রতিক্রিয়া দর্শনে ফেরেশতা প্রধান জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম স্তম্ভিত এই চিন্তায় যে আমি পবিত্র কোরআন নিয়ে এলাম আপনার সমীপে কিন্তু এর রহসাবলী আমি কিছুই বুঝলাম না আর আপনি এর সবই বুঝে গেলেন। উপরিক্ত বর্ণনার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে রাহমতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান রব্বুল আলামীনের সরাসরি প্রিয়তম শিষ্য। সুতরাং যে নবীর একমাত্র শিক্ষাগুরু স্বয়ং মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআন যার পঠিত মহাগ্রন্থ। যা আদি অন্তের সর্ব বিষয়ের সর্বপ্রকার জ্ঞানের ভাণ্ডার। সেই নবীর "ইলম" নিয়ে যদি কোন অভিশপ্ত বাতিলপন্থী মন্তব্য করেন যে নবী ইলমে গায়ের জানেন না। তিনি এটা জানেন না, ওটা জানেন না (নাউযুবিল্লাহ্) তাহলে তাকে আর যাই কিছু বলা হোক, মুমিন বলে আখ্যায়িত করা যাবে না। কারণ নবীর শানে এর চেয়ে বড় জঘন্যতম জুলুমও অবমাননা আর কিছুই হতে পারে না।

নবীর শানে সর্বোচ্চ সম্মান মর্যাদা প্রদর্শন করার নামই ঈমান এবং তার বিপরীত করা কুফরী।

আদি-অন্তের সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার :- শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি জ্ঞানের অভাব বা অপূর্ণতা পরিলক্ষিত হয় তবে তার তিনটি কারণ হতে পারে।

প্রথমতঃ শিক্ষকের জ্ঞান পরিপূর্ণতা না হওয়া কিংবা শিক্ষক জ্ঞান দানে কৃপন হওয়া।

দ্বিতীয়ত : পঠিত গ্রন্থের জ্ঞান অপরিপূর্ণ হওয়া।

তৃতীয়তঃ শিক্ষার্থী জ্ঞান আহরণে অযোগ্য অনুপযুক্ত হওয়া। এছাড়া চতুর্থ কোন কারণ হতে পারে না। আলোচ্য আয়াতের মর্মবাণীর আলোকে প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ হলেন শিক্ষাগুরু রসুল সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রিয়তম শিষ্য এবং পবিত্র কোরআন কারীম হল পঠিত মহান গ্রন্থ। উপরিউক্ত তিন কারণের কোনটি আল্লাহ রসুল ও কোরআনের মধ্যে নেই সন্দেহাতীতভাবে । কেননা আল্লাহ রব্বুল আলামীন সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু । নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী আর পবিত্র কোরআন হলো সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ। যা সকল প্রকার জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার । সুতরাং রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আদি অন্ত জাগতিক পরলৌকিক স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কিত প্রকাশ্য- অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ট ভাণ্ডার বা ধারক। তিনিই মহান আল্লাহর শিষ্য, আর সমগ্র সৃষ্টি হলো তাঁরই শিষ্য। সমগ্র মাখলুকাতের সকল প্রকার জ্ঞান হল তাঁরই জ্ঞান সমুদ্রের একেকটি বিন্দু কণা স্বরুপ। যেমন বিশ্ববিখ্যাত ইমাম আল্লামা শারফুদ্দীন বুছিরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কছীদায়ে বুরদাহ শরীফে বলেছেন-

ومن علومك علم اللوح والقلم

অর্থাৎ ওহে আল্লাহর রসুল! লাওহে মাহফুজ এবং কলম এর জ্ঞান হল আপনার সুবিশাল জ্ঞান সাগরের সামান্য অংশ বিশেষ

আর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে এরশাদ করেছেন-

اعطيت علم الاولين والاخرين

কোরআনের আলো বাকী অংশ ১৮ পৃষ্ঠায়

আমরা সাধারণত: ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ হিসেবে বলে থাকি 'ইসলাম' শব্দের অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা ইত্যাদি। মূলতঃ অভিধান শাস্ত্রের পরিভাষায় দেখা যায় ইসলাম শব্দের অর্থ হল অনুগত হওয়া, আল্লাহ্‌র নিকট উৎসর্গ হয়ে যাওয়া মূলতঃ ইসলাম ধর্মের অনুসারী হওয়ার মধ্যেও আল্লাহ্‌র নিকট দাসত্বে উৎসর্গ হওয়ার শিক্ষায় মূখ্য উদ্দেশ্য। যেমন- আল্লাহ্ বলেন- "আমি জ্বীন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য (সুরা বাকারা) তাইতো এই খোদায়ী রাজত্বের পৃথিবীতে মানুষের কোন কর্তৃত্ব নেই। এ পৃথিবীতে মানুষ মানুষের জন্য সহযোগী, প্রতিটি মানুষ স্বাধীকার ভোগ করবে, কেউ কারও অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। শুধুমাত্র একটি অধিকার মানুষ মানুষের উপর ভোগ করতে পারবে, তা হলো একমাত্র আল্লাহ্‌র পথে আল্লাহ্‌র এবাদত পালনের জন্য সৌজন্যমূলক ভাবে আহ্বান করবে। এই হিসেবে পৃথিবীতে বিরাজমান সকল ধর্ম পালনে স্বাধীকার থাকবে অগ্রগণ্য। তাইতো এই নীতিমালার আলোকে রাসূল (দ.) মদীনায় যে রাষ্ট্রকাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাকে শুধু দাবীতে নয় বাস্তবেও আধুনিক সভ্যতার এই সময়ে অত্যন্ত যুগোপযোগী বলে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে। মদীনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, সার্বজনীন, ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির গ্যারান্টিস্বরূপ জীবন ব্যবস্থা।

খোদায়ী কর্তৃত্বে পরিচালিত এ ধর্মে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের শ্রেষ্ঠত্বকে শিরোধার্য রেখে আল্লাহ্‌র ভীতিকে মানব জীবনে জারি রাখার জন্য, মানুষকে স্বীয় শক্তিতে পরিচিতি লাভ করার জন্য ইসলামকে পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন আল্লাহ্‌তায়ালা। এ পাঁচটি স্তম্ভ হল- ঈমান, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত। এ পাঁচটি স্তম্ভই এক একটি দিক থেকে তাৎপর্য বহন করেন। তেমনি রমজানেরও একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। সীমাবদ্ধ জ্ঞানলোকে রমজানের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব দিকটি আলোচনা করতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাব।

ইসলাম ও রমজান : রমজান বা রোযাকে পবিত্র কুরআনুল করিমে দু'টি শব্দে নামকরণ করেছেন ; একটি হল রমজান যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে "শাহরু রামাদানাল্লাজি উনজিলা ফিহিল কুরআন" অপরটি হল 'সওম' যেমন-কুরআনুল করীমে বলা হয়েছে- "ইয়া আইয়্যুহাল লাজিনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম" অর্থাৎ হে ঈমানদার তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে, নামকরণের দিক থেকে আমরা শব্দ দুটি দ্বারা রোযা পালনকে বুঝলেও অভিধান শাস্ত্রের পরিভাষায় শব্দ দুটির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ রয়েছে। রমজান শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল- জ্বালিয়ে ফেলা পুড়িয়ে ফেলা। আর সিয়াম শব্দের আভিধানিক অর্থ হল- বিরত থাকা; দূরে থাকা। দুটি শব্দেই অবস্থানগত দিক থেকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং আলাদা তাৎপর্যও রয়েছে। সিয়াম শব্দের আলোকে রোযার পারিভাষিক অর্থে সংজ্ঞা হবে যাবতীয় পানাহার, জৈবিক কামনা বাসনা, অতিরিক্ত কথা বলা ও যাবতীয় গালমন্দ থেকে বিরত থাকার নাম রোযা। আর রমজান শব্দের আলোকে পারিভাষিক অর্থের সংজ্ঞা হবে রমজানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পারস্পরিক হিংসা ক্রোধকেও প্রচুর ইবাদতের মাধ্যমে পাপ পংকিলতাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, ধ্বংস করে মানুষ পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ়তর করে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা হওয়ার নাম রোযা। এ নিয়মকে রমজান রোযা, সিয়াম, আমরা যাই বলি না কেন এ উপবাস প্রথা নতুন কিছু নয়। আমরা অনেকেই আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের কারণে ধারণা করে থাকি বা এখনও বিশ্বাস করি যে, রমজান হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর প্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম থেকে শুরু। মূলতঃ এ ধারণা মোটেই সঠিক নয়। হযরত আদম (আ.) এর উপর আইয়্যামে বীজ এর দিন এবং মুসা (আ.) এর উপর মোহররমের দশ তারিখ রোযা পালন করা ফরজ ছিল (তাফসীরে সাবী) হযরত মুসা (আ.) চল্লিশ দিন রোযা রাখতেন এবং তার উম্মতদেরকেও নির্দেশ দিতেন। হযরত ঈসা (আ.) ও ৪০ দিন রোযা রাখতেন তার বংশধরদেরকেও রোযা রাখার নির্দেশ

এ সাধনাকে আধ্যাত্মিক সাধনা বলে থাকে। যাকে আরবী ভাষায় বলা হয় এলমে তাসাউফ বা সুফী তত্ত্ব। যুগে যুগে যারা এলমে তাসাউফ তথা সুফীতত্ত্বের সাধনা করেছেন তারা সুফীবাদের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন।

১. সুফী সাধক আল্লামা আখন বসর হাফী বলেন, "আল্লাহর স্মরণ দ্বারা যিনি আত্মাকে পবিত্র করে রাখেন তাকে সুফী বলা হয়।"

২. সুফী সাধক আবু মোহাম্মদ আল জারিরীর মতে "সমস্ত অনিষ্টকর কামনা হতে হৃদয়কে মুক্ত করা এবং সদগুণ গড়ে তোলাই সুফীবাদ।"

৩. সুফী সম্রাট আল্লামা জুনায়েদ বোগদাদীর মতে "জীবন মৃত্যু ও অন্য সকল বিষয়ে আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতাই সুফীবাদ।"

৪. মারুফ আল খারকীর মতে "ঐশী সত্তার উপলব্ধিই সুফীবাদ"।

৫. সুফী সম্রাট যুননুন মিশরীর মতে "আল্লাহ্ ছাড়া সবকিছু বর্জন করাই সুফীবাদ"।

মোটকথা ইসলামী শরীয়তের বিধানালোকে মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনই আধ্যাত্মিকবাদের মর্মকথা। উল্লেখ্য যে, তা বৈরাগ্যবাদের মাধ্যমে নয়। বৈরাগ্যবাদহীন সুফীতত্ত্ব সম্পূর্ণ ইসলাম সম্মত এবং তা ইসলামের শিক্ষারই ফল। আর কোরআন ও হাদীস সুফীবাদের প্রধান উৎস। ইহা অন্য কোন ধর্ম হতে উৎপত্তি লাভ করে নাই। পবিত্র কুরআনুল করীমের গভীর ভাববাদী অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বহু আয়াত রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, [তিনি (আল্লাহ্) আউয়াল (আদি) আখের (অন্ত) দৃশ্য ও অদৃশ্যের মালিক এবং তিনি সবকিছু সম্পর্কে অবহিত] ["আল্লাহ্ পূর্ব পশ্চিম সবদিকে বিদ্যমান তোমরা যে দিকে মুখ ফিরাওনা কেন সেখানে আল্লাহর বাস্তব অস্তিত্ব বিদ্যমান"] হাদীসে কুদ্সিতে রয়েছে [আমি আল্লাহ্ একটি গুপ্তধন এবং আমি চাই সকলে আমাকে জানুক; সেহেতু আমি সৃষ্টি করেছি যাতে আমার পরিচয় লাভ করতে পারে।]

উল্লেখিত আয়াতগুলোর মত পবিত্র কুরআনুল করীমের বিভিন্ন আয়াতের রহস্য উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে আল্লাহর কুরআন ও হাদীসের উপদেশেই হল সুফীবাদ। হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজের জীবনেই গভীর ধ্যান ও চিন্তার মেরাজের শিক্ষা গ্রহণ করা কিন্তু সুফীবাদী কার্যক্রমের পরিচয় দিয়েছিল। কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার আলো সুফীবাদের যে বীজ নিহিত আছে তারই ভিত্তিতে ও বহিঃবিশ্বের প্রভাবে তা পুষ্ট হয়েছিল।

আধ্যাত্মিকতাবাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য : মানুষের এই পৃথিবী সৃষ্টিতে একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল। তার সৃষ্ট বান্দাও যে সমস্ত কাজ করে জীবনযাপন করে সবক্ষেত্রেই এক একটি লক্ষ্য উদ্দেশ্য বিদ্যমান। অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিকতাবাদের সাধকদেরও এক একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে তন্মধ্যে প্রধান উদ্দেশ্য গুলো নিম্নরূপ :- (১) খোদা প্রেম (২) অশ্লীলতা মুক্ত জীবন (৩) মানব প্রেম (৪) আল্লাহর নৈকট্য অর্জন। কিছু কতক মানুষ রয়েছে যারা এ দুনিয়াতে মনকে না লাগিয়ে খোদায়ী বিধান পালনে সর্বদা ব্যস্ত থাকে, এবং খোদার ভালবাসা পেতে সর্বদা থাকে উদগ্রীব। যেভাবে একজন প্রেমিক তার প্রেমিকার মন জয় করতে সর্বদা ব্যাকুল থাকে। তারা খোদার ভালবাসা পাওয়ার প্রত্যাশায় এত কঠোর সাধনা করে যেভাবে বান্দা খোদা আল্লাহতায়ালা প্রত্যাশা করে। ঐ বান্দা সদা সর্বদা ভীত থাকে এই কারণে যে কোন দোষে আল্লাহ্ তার উপর নারাজ হচ্ছেন কিনা। অনুরূপ একটি ধর্মীয় এবাদত হলো মাহে রমজানের রোযা পালন। এ রমজানের মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়া যায়। এটি মোত্তাকী হওয়ার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। আল্লাহ্ নিজেও বলেছেন- "আমি তোমাদের উপর রোযা অবতীর্ণ করেছি যাতে মোত্তাকী হতে পার। রমজানের মত কঠোর এবাদতের মধ্যে খোদা ভীতির চরম উন্মেষ ঘটে। খোদাকে না দেখেও দেখছে মনে করে সারাদিন উপবাস থাকে সুতরাং আল্লাহ্ ঐ বান্দাকে নিশ্চয় ভালবাসেন এবং ভালবাসার প্রতিদানও দিবেন নিজের হাতে। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ বলেন, "রোযা আমার জন্য আমি (আমাকে পাওয়ার জন্য) নিজেই ইহার প্রতিদান দিব। (কারও মাধ্যমে নয়)।

আধ্যাত্মিকতাবাদের দ্বিতীয় দিক হল অশ্লীলতামুক্ত জীবনযাপন

রয়েছে। আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের জন্য যে সমস্ত মাধ্যম অবলম্বন করা হয় সব মাধ্যমই রোযাদারের জন্য উন্মুক্ত। পবিত্র হাদীস শরীফের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন-

১। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রসুল (দ.) ইরশাদ করেছেন রমজান মাস প্রবেশ করলে আসমান ও বেহেশতের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে বন্দী করা হয়। (বোখারী ও মুসলিম) আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বান্দাকে আল্লাহ্‌ দেখা দেওয়ার স্থান সমূহের অবরুদ্ধ দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়।

২। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (দ.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে (অর্থাৎ শরীয়তকে সত্য জেনে এবং রোযা পরজ হওয়ার উপর বিশ্বাসী হয়ে) এবং ছওয়াবের উদ্দেশ্যে (লোক দেখানোর উদ্দেশ্য নয়) রমজানের রোযা রাখবে তার অতীতের সকল গুণাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম) বুঝা যায়, রোযা মাধ্যমে অর্জিত হয় পূণ্য আর পূণ্যবান ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করতে পারে।

৩। রোযাদারের আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়ে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (দ.) ইরশাদ করেছেন, বনী আদমের প্রত্যেকটি নেক আমলের ছওয়াব এমনিভাবে একনেকী ১X১০ = ১০X৭=৭০ পর্যন্ত। আল্লাহ্‌তায়ালা ইরশাদ করেন, রোযা আমার জন্য আমিই এর প্রতিদান দেব। অর্থাৎ বিনিময় কি দেব তা আমি জানি। আমি স্বয়ং রোযার বিনিময় দেব, কারো মাধ্যমে নয়। যেহেতু রোযাদার নিজের অভিলাষ ও খাবার থেকে একমাত্র আমার জন্যই উপবাস থাকে। রোযাদারের জন্য দুটি খুশি, একটি খুশি হল ইফতারের সময়। আরেকটা খুশি হল পরওয়ারদেগারের সাথে মোলাকাতের সময়। রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্‌র কাছে মেশকের চেয়েও অধিক পছন্দনীয়। (বোখারী ও মুসলিম)

৪। রোযদার বান্দাকে আল্লাহ্‌ কর্তৃক কবুল করে নেওয়ার জন্য রোযা আল্লাহ্‌র দরবারে সুপারিশ করবে। যেমন- হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল (দ.) ইরশাদ করেছেন- কোরআন ও রমজানে আল্লাহ্‌র কাছে বান্দার জন্য প্রার্থনা করবে। বলবে, হে পরওয়ারদেগার! নিশ্চয় আমি তাকে খাবার ও আকাংখার বস্তুসমূহ থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার স্বপক্ষে আমার সাক্ষ্য কবুল কর। (বায়হাকী)।

৫। এ মাসে এমন একটি রজনী রয়েছে, যাতে আল্লাহ্‌ বান্দাকে নৈকট্য দেওয়ার জন্য বান্দার কাছাকাছি এসে যান এবং বলেন, কোন বান্দা আছে যে আজ আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে।

সপ্ত দর্শন তরীকা

মুহাম্মদ বদিউল আলম জিহাদী

মাইজভাণ্ডারে নিত্য জ্বলে মুক্তির আলোক বর্তিকা,
পাইতে মুক্তি কবুল কর সপ্ত দর্শন তরিকা ॥
ফানা আনিল খালক এবং ফানা আনিল হাওয়াতে,
'মওতে আরবায় গ্রহণ কর প্রবৃত্তি দমন করিতে।
খোদার দর্শন মিলবে যখন চিনবে আপন প্রেমিকা ॥
কর যদি মুক্তির আশা, ছাড় দুনিয়ার লোভ লালসা,
মনে প্রাণে অর্জন কর ভাণ্ডারীর ভালবাসা।
মাইজভাণ্ডারীর দয়ার গুণে মিলবে মুক্তি বটীকা ॥
গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী সেই তরীকার প্রবর্তক,
নিজের কাজের নিজেই কাজী, নিজেই ধারক ও বাহক।
নিজ নজরে দূরীভূত করেন ভক্তের সমীক্ষা ॥
সেই তরীকার সাধক পুরুষ, বাবাজান কেবলা রহমান,
অছিয়ে ভাণ্ডার দেলা-ময়না ছিল ইহার সু-প্রমাণ।
আমিনুল হক ছোট মাওলানা ছিল বাস্তব ছলীকা ॥
পরনির্ভর, অনর্থ আর নফছানিয়ত পরিহার করিয়া,
স্বল্প আহার, আত্মশুদ্ধিকর, লোভ-লালসা ছাড়িয়া,
কামিয়াবী হাছিল হবে, অল্প তুষ্টি দিলে পরীক্ষা
মাইজভাণ্ডারী দর্শন নীতি অর্জন করে জীবনে,
আপন সত্ত্বা বিলীন কর ভাণ্ডারীর চরণে,
'আলমস্ব বলে সফল হবে হলে বাবার সেবিকা।

নেমে আসে এবং রাস্তার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে ডাকতে থাকে, "ওহে মহানবী (দ.) এর উম্মতগণ! তোমরা আস এবং আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হও। তোমাদের ঘর থেকে বের হয়ে আস। আল্লাহ্ তোমাদেরকে পুরস্কৃত করবেন।" আল্লাহ্‌র বান্দারা মসজিদে কিংবা ঈদগাহে ঈদের নামায আদায় করতে যায়, তখন আল্লাহ্‌তা'আলা ফেরেশ্‌তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, "যারা ঈদের নামায পড়ার জন্য উপস্থিত হয়েছে তাদের পুরস্কার কি হওয়া উচিৎ?" ফেরেশ্‌তারা উত্তরে বলেন, "ওহে প্রভু! আপনি তাদেরকে তাদের প্রাপ্য দিয়ে দেন।" তখন আল্লাহ্ বলেন, "ওহে আমার বান্দারা! তোমরা আমার কাছে কিছু চাও। আমি আমার ইজ্জতের কছম খেয়ে বলছি, তোমরা যদিএ বিশাল জ'মাতে পরকালের জন্য কিছু চাও, তা' আমি অবশ্যই দেব। আর যদি এ পার্থিব জগতের জন্য কিছু চাও, সেটাও আমি বিবেচনা করব। (যদি সেটা তোমার জন্য প্রযোজ্য হয়)। তোমরা একজন নিস্পাপ শিশুর মত বাড়ি ফিরে যাও। তোমরা আমাকে সন্তুষ্ট করেছ এবং আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট।" (আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস; বায়হাকি)। অনুরূপ একটি হাদীস হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। মহানবী (দ.) আরও বলেন, "পবিত্র রমজান মাসের শুরু থেকে লায়লাতুল কদর পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে ষাট হাজার দোযখগামী লোককে মুক্ত করে দেন, লায়লাতুল কদর পর্যন্ত যতসংখ্যক লোককে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দেয়া হয়, কেবল লায়লাতুল কদরের রাত্রে তার সমসংখ্যক লোককে দোযখের আযাব থেকে মাফ করা হয় এবং পবিত্র রমজান মাসের শুরু থেকে

খুত্‌বা শুনার মধ্য দিয়ে ঈদের উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। লোকজন নুতন জামা-কাপড় পড়ে, বিভিন্ন সুগন্ধি ব্যবহার করে এবং তাদের আত্মীয়-স্বজন, ছেলে-মেয়েকে সাথে নিয়ে ঈদগাহে কিংবা মসজিদে জমাতের সাথে ঈদের নামায পড়তে যায়। ঈদের নামায পড়ার পরপর মুসল্লিরা একে অপরের সাথে কোলাকুলি করে এবং সকল প্রকার শত্রুতা, হিংসা-ঘৃণা ভুলে যায়। তারা প্রত্যেকে একে অপরের বন্ধু হয়ে যায়। ঈদের এ পবিত্র পরিবেশ সত্যি বিস্ময়কর। ছোটরা বড়দেরকে সালাম করে, পিতামাতাকে কদমবুচি করে, বন্ধুরা পরস্পর শুভেচ্ছা জানায়। এভাবে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে একে অপরের কাছাকাছি আসে, সকল ভেদাভেদ ভুলে যায়। কবরস্থানে গিয়ে মুরুব্বী ও আত্মীয়-স্বজনদের কবর জেয়ারত করে, বিদায় নেয়া স্বজনদের স্মৃতি রোমন্থন করে। আজ ধনী-গরীব, সাদা-কালো, উঁচু-নীচু এরূপ কোন তফাৎ নেই। সবাই একে অপরের সাথে খোলা মন ও আন্তরিকতা নিয়ে পরম শ্রদ্ধায় কিংবা ভালবাসায় আলিঙ্গন করে, জড়িয়ে ধরে আন্তার স্পর্শ নিবেদন করে। সাম্য, মৈত্রী, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের এ দৃষ্টান্ত সত্যি বিরল। লোকজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও বিরল। শুভাকাঙ্খীদের বাড়ী বা বাসায় যায় এবং একে অপরের খোঁজ-খবর নেয়। মেহমানদেরকে সাদর-সম্ভাষণ জানানো হয় এবং উত্তম নাস্তায় আপ্যায়ন করা হয়। প্রত্যেকে যার যার সামর্থ্য অনুসারে আপ্যায়ন করে। বিভিন্ন রকমের মিষ্টি এবং সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা হয়। মেহমান এবং আপ্যায়নকারী উভয় পক্ষই আনন্দ উপভোগ করে। এরূপ ব্যবস্থা মান-মর্যাদা নির্বিশেষে সকলের মাঝে সামাজিক এবং মানবিক বন্ধন সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে।

সারিতে যাকাত নেয়ার জন্য ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঢাকা শহরের অদূরবর্তী এক ধনী লোকের বাসভবনের সামনে ১৯৮০ সালের আগস্ট মাসের ১৭ তারিখে দু'জন শিশুসহ ১৫জন ভিক্ষুক মারা যায় পদদলিত হয়ে। একই ধরনের দুর্ঘটনা চট্টগ্রাম, চাঁদপুরসহ দেশের অন্যান্য শহরেও সংঘটিত হতে দেখা যায়। এরূপ প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশ যদি বিদ্যমান থাকে, তাহলে ঈদের আনন্দ মাটি হয়ে যাবে। বাংলাদেশে ঈদ আসে সুবিধাবঞ্চিত ও দারিদ্রপীড়িত মানুষদের ঘরে ক্ষণিকের তরে আনন্দের বার্তা নিয়ে। অভাব এবং বঞ্চনার কারণে ঈদের প্রকৃত তাৎপর্য অবহেলিত হয়। ঈদ এদেশে ধনী লোকদের বিলাসিতা এবং গরীবদের বঞ্চনার মধ্যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে যা সম্পূর্ণরূপে অনভিপ্রেত। আমরা কী ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু, কালো-সাদা, নির্বিশেষে মহানবী (দ.) এর আদর্শ অনুসরণে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করে সকলের মাঝে ঈদের আনন্দ সমভাবে ভাগাভাগি করে নিতে পারি না? আমাদেরকে অবশ্যই তা করতে হবে। এ মহান লক্ষ্য অর্জনে আমাদের বিবেককে জাগ্রত করতে হবে। এটা খুবই দুঃখজনক যে, ঈদের প্রাক্কালে আমাদের ব্যবসায়ীরা খাদ্য দ্রব্য এবং কাপড়-চোপড়ের দাম বাড়ানোর জন্য কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মওজুদদারী, মুনাফাখোরীসহ বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডের আশ্রয়গ্রহণ করে থাকে যার ফলে উল্লেখিত দ্রব্যসমূহ ভোগ করা থেকে গরীবরা বঞ্চিত হয় এবং দ্রব্যমূল্য নাগালের বাইরে চলে যাবার দরুন সাধারণ নিম্নবিত্ত লোকজনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা ঈদুল ফিতরের আদর্শের পরিপন্থি। যে কোন প্রকারে এ ধরনের মানসিকতা ও আচরণ পরিহার করতে হবে।

ঈদুল ফিতরের আনন্দ হবে শরীয়তের নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ঈদের আনন্দের নামে অশ্লীল ও নগ্ন নাচ-গান, অশ্লীল সিনেমা, যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা, জুয়া খেলা প্রভৃতি অসামাজিক কার্যকলাপ ঈদুল ফিতরের প্রকৃত চেতনাকে ব্যাহত করে। এগুলো সম্পূর্ণরূপে

আল্লাহ্তালা ফেরেশ্তাদের কাছে তাঁর রোযাদার বান্দাদের জন্য গর্ব করেন এবং বলেন, 'কাজের শেষে সকল শ্রমিক পারিশ্রমিকের জন্য দরখাস্ত করে। আমার বান্দারা সুদীর্ঘ এক মাস কাল রোযা রেখেছে। তারা এখন ঈদের জ'মাতে দাঁড়িয়েছে। তারা তাদের পুরস্কারের জন্য প্রার্থনা করছে। তোমরা (ফেরেশ্তারা) এদের জন্য সাক্ষী থাক। আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তখন একজন ফেরেশ্তা বলবেন, 'ওহে মহানবী (দ.) এর উম্মতগণ! তোমরা এখন বাড়ী ফিরে যাও। তোমাদের পাপগুলো পূণ্য কাজে (নেক আমলে) রূপান্তরিত হয়েছে। অতঃপর মহান আল্লাহ্তা'আলা বলবেন, 'তোমরা সুদীর্ঘ এক মাস রোযা রেখেছ এবং ইফতার করেছো আমার সন্তুষ্টির জন্য। সুতরাং তোমরা সম্পূর্ণ নির্দোষ ও নিষ্পাপ হয়ে বাড়ী ফিরে যাও।" (হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস, বায়হাকি)। মুসলমানগণ পবিত্র রমজান মাসে সুদীর্ঘ এক মাস যাবৎ আত্মসংযম, সততা, সত্যবাদিতা, ত্যাগ, উৎসর্গ, খোদা-ভীতি, আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য, নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতার জন্য প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে। ঈদুল ফিতর হচ্ছে পবিত্র রমজান মাসের প্রশিক্ষণান্তে সমাপনী উৎসব। আসুন, বাকী এগার মাসের জন্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এ দীর্ঘ প্রশিক্ষণের শিক্ষা কার্যকর ও দক্ষভাবে বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ করি যাতে ঈদুল ফিতর সত্যিকার অর্থে আমাদের জন্য অর্থবহ ও উপকারী হয়। আমরা কি পবিত্র রমজান মাসের শিক্ষার আলোকে আমাদের জীবন এবং সমাজকে বিনির্মাণ করতে পারি না? আমাদেরকে আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল পরকালের জন্য যাত্রার প্রস্তুতি কতটুকু তা মূল্যায়নের জন্য আত্ম-সমালোচনা করতে হবে। মহান আল্লাহ্তা'আলা আমাদের সীমাবদ্ধতা কতটুকু তা উপলব্ধি করার জন্য এবং সীমাবদ্ধসমূহ দূরীকরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তওফিক আতা করুন। আমিন। বেহুরমতে সাইয়েদিল মোরসালিন।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে আগত জায়েরীন ভক্ত-অনুরক্তদের নৈশকালীন সময়ে চলাচলের সুবিধায় নাজিরহাট থেকে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ পর্যন্ত তিন কিলোমিটার সড়কের বৈদ্যুতিক পোল-এ প্রতিস্থাপিত লাইট সার্ভিস ১৯ জুলাই ২০১৩ তারিখে বিকেল ৪টায় শুভ উদ্বোধন করা হয়। আলহাজ্ব মোস্তফা হাকিম ওয়েলফেয়ার ফাউণ্ডেশন এর উদ্যোগে স্থাপিত এই আলোকন ব্যবস্থার উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র এম মঞ্জুর আলম। জায়েরীনদের বহুল প্রত্যাশিত এই সড়ক আলোকায়নের ব্যবস্থার জন্য দরবারে পাকের পক্ষ থেকে ফাউণ্ডেশনের সকল

আঞ্জুমানে মোস্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারীর পক্ষ থেকে আয়োজনের উদ্বোধক চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মনজুর আলমকে স্বাগত জানিয়ে একটি ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। নাজিরহাট থেকে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ পর্যন্ত তিন কিলোমিটার লাইট স্থাপন করা হয়। লাইন সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৩টি মিটারে বিভক্ত করে দরবারেপাকের আওলাদদের মধ্যে গাউছিয়া আহমদিয়া মজ্জিলে আঞ্জুমানে মোস্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারীর সভাপতি সাজ্জাদানশীনে দরবার আলহাজ্ব শাহ্সূফী ডা. সৈয়দ দিদারুল হক, রহমান মঞ্জিলের আলহাজ্ব শাহ্সূফী সৈয়দ মুজিবুল বশর ও গাউছিয়া হক মঞ্জিলের

নাজিরহাট থেকে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ পর্যন্ত সড়ক বাতি উদ্বোধন প্রকল্পে আঞ্জুমানে মোস্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারীর পক্ষ থেকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়রকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়

কর্মকর্তা, এলাকার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্ব দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি কামনা করে মুনাজাত পরিচালনা করেন আওলাদে গাউসুলআজম আলহাজ্ব শাহ্সূফী ডা. সৈয়দ দিদারুল হক মাইজভাণ্ডারী, গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারীর তরিকা ও আদর্শবাহী সংগঠন আলহাজ্ব শাহ্সূফী সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান যথাক্রমে উক্ত লাইট সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সড়ক বাতি উদ্বোধনের এই অনুষ্ঠানে আওলাদে মাইজভাণ্ডারীসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সাম্য ও মৈত্রীর চেতনার স্বর্গীয় সমাজ নির্মাণ। ফলে ঈদ -উল-ফিতরকে চরম উপলব্ধি ও অনুভব করার জন্য যেমন পূর্বের এক মাসব্যাপী সিয়ামের বিধান দেয়া হয়েছে।অনুরূপ ঈদ উল আযহার পূর্বদিন মুসলিম মিল্লাতের মহাসম্মিলনের তথা হজ্বের বিধান দেয়া হয়েছে। অনুরূপ ঈদ-উল আযহার পূর্বদিন মুসলিম মিল্লাতের মহাসম্মিলনরে তথা হজ্বের বিধান দেয়া হয়েছে। পবিত্র হাদিস শরীফে বিভিন্ন ছত্রে ঈদের তাৎপর্য বর্ণনায় বলা হয়েছে।

১. দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর মহান আল্লাহর পক্ষ হতে পুরস্কার স্বরূপ ঈদ উল ফিতর। ২.ফলতার দিবস ৩. মুক্তির দিবস ৪. আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্তির দিবস ৫. ক্ষমার দিবস ৬. নিয়ামত প্রাপ্তির দিবস ৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলুইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত চর্চার দিবস ৮. ইসলামী সংস্কৃতির পুনজাগরণ দিবস, ৯. বৈষম্যহীন সমাজ গঠন দিবস ১০. ভ্রাতৃত্ব সাম্য ও মৈত্রী দিবস।

এ বিষয়ে একটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঈদের দিন আগমন করার সঙ্গে আসমান হতে ফিরিশতারা ভূমণ্ডলে নেমে আসেন, আর রাস্তার মোড়ে মোড়ে অবস্থান নেয় এবং ডাক দিয়ে বলেন, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উম্মত! তোমরা দয়ালু প্রভুর দরবারে এসে হাজির হও; তোমরা বেরিয়ে পড়ো; তিনি তোমাদেরকে পুরস্কার দেবেন। এবং তোমাদের ক্ষমার আযোগ্য পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন। অতঃপর বান্দারা যখন ইদগাহে সমবেত হয় তখন মহান আল্লাহ ফিরিশতাদের সম্বোধন করে বলেন, হে ফিরিশতারা! আমরা এ বান্দাদের পুরস্কার কী হতে পারে? ফিরিশ্তা সকল বলেন, হে প্রতিপালক! আপনি তাদের প্রাপ্য দিয়ে দিন। একপর্যায়ে মহান দয়াময় প্রভু বলতে থাকেন, ওহে বান্দারা! তোমরা আমার কাছে চাও। আমি আমার ইজ্জতের শপথ করে বলছি, তোমরা আজকে (ঈদের নামাজান্তে) যদি পরকালের করব। তোমরা নিস্পাপ হয়েই ফিরে যাও। তোমরা আমাকে সন্তুষ্ট করেছ। আর আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। (বায়হাকী)

মহান আল্লাহর ঈদের দিন এ পুরস্কারের ঘোষণা মূলত সেই প্রতিশ্রুতি যেটি রোজাদারের জন্যই দিয়েছিলেন : "রোজা আমার আমি নিজেই তার প্রতিদান দেব।" রমজান মূলত পরীক্ষার মাস আর শাওয়ালের প্রথম দিবস ঈদ উল ফিতর তার সফলতার দিন।

রমজান মাসে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে যে বৃক্ষটি রোপন ও পরিচর্যা দ্বারা বড় করা হলো মাস শেষে তার ফল ভোগ করার নামই ঈদ উল ফিতর । তাই দেখা যায়, 'ফিতর' এর অর্থ আঙ্গুর ফল অঙ্কুর হওয়া। অথবা সবুজ ঘাস উদ্গিত হওয়া। যারা সাধনায় কৃতিত্ব রেখেছে তাদের ইহকাল ও পরকালের সফলতার দিনক্ষণ ঈদ উল ফিতর। আমরা কী সত্যিকারের সিয়াম সাধনা করে সফল হওয়ার মত যোগ্যতা কী অর্জন করতে পেরেছি? এত গুলো আধ্যাত্মিক গুরুত্বের কিছু কথা। ঈদ উল ফিতরের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক যে গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে তার কতটুকু আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি তাও চিন্তার বিষয়।

ঈদের যে সামাজিক আবেদন তা হল ১. ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নিচু, জাত-পাত, ছোট- বড়, ভুলে গিয়ে ভ্রাতৃত্ববোধ উজ্জীবীত হয়ে একটি শ্রেণীহীন বৈষম্যহীন সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ গড়ে তোলা। যা পবিত্র ঈদগাহে দারুণভাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ঈদের নামাজ শেষে সেই ঐক্য ও সাম্যের কিঞ্চিত রেষ আর কী অবশিষ্ট থাকে? বরং দিনের পর দিন বৈষম্যের অতিমাত্রিক বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করার মত । অথচ প্রিয় নবী (দ:) ঈদগাহের সেই ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও শ্রেণী সাম্যের জাগরণ পুরো সমাজকে আলোকিত করেছিলেন। যা এখনও ইসলামের শ্রেষ্টত্বকে প্রমাণ হিসেবে দৃষ্টান্ত দেয়া যায়। কিন্তু আমরা ঈদের সেই চেতনাকে করেছি অনিষ্ট, শুধু নিজের জন্য নিজেকে করেছি বলিষ্ঠ।

আর্থিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়েও ঈদ উল ফিতরের তাৎপর্য ও গুরুত্ব কম নয়। পবিত্র ঈদ উল ফিতর, তারও পূর্বে রমজান মাসে মুসলিম সমাজের সামর্থবান ব্যক্তিবর্গ তাদের যাকাত গরীব মিচকিন ও নিঃস্বদের দিয়ে থাকেন এবং ঈদের দিন

পৃথিবীর চিরন্তন রীতির কাছে হার মেনে বর্ষের পর বর্ষ ঋতু চক্রের ন্যায় খুশির বার্তা নিয়ে বিশ্ব মুসলিমের দরবারে ঘুরে আসে মহান ঈদ মোবারক। ঈদ আরবী শব্দ এর অর্থ বার বার ঘুরে আসা, মুসলমানদের আনন্দ উৎসবের দিন, অন্য অর্থে পরমানন্দ। ফিরুজুল লোগাত ও আল মুনজিদে উল্লেখ আছে প্রত্যেক ঐ দিবসকে ঈদ বলে যা সুবিখ্যাত কোন ব্যক্তি বা সুপ্রসিদ্ধ কোন ঘটনার স্মরণে উদ্‌যাপিত হয়। আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র.) আল মুফরাদাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন আনন্দ উৎসব রয়েছে এমন প্রত্যেক দিবসের জন্য ঈদ শব্দটি ব্যবহারযোগ্য। এর সমর্থনে পবিত্র কুরআন কারীমের সুরা মায়েদার ১১৪নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে- অর্থাৎ মরিয়াম তনয় হযরত ঈসা (আ.) আরজ করলেন, হে প্রতিপালক! আমাদের উপর আকাশ থেকে একটা খাদ্য খাঞ্চা অবতরণ করুন, যা আমাদের জন্য ঈদ বা আনন্দ উৎসব হবে। আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য এবং আপনারই নিকট থেকে নিদর্শন এবং আমাদেরকে রিযিক দান করুন আর আপনিতো সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা। এ আয়াতে "তা'কুনুলানা ঈদান" এর তাফসীর করতে গিয়ে বলেন সেটা (খাদ্য-খাঞ্চা) অবতরণের দিবসকে ঈদ বা উৎসবের দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করবো, সেটার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবো, খুশি প্রকাশ করবো। আপনারই ইবাদত করবো এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো। এটা ছিল হযরত ঈসা (আ.) এর ফরিয়াদ। এতে প্রমাণিত হয় আল্লাহ্ প্রদত্ত কোন নিয়ামত প্রাপ্তিতে ঈদ বা আনন্দ উদ্‌যাপন নবীগণের সুমহান আদর্শ। আল কুরআনের সুরা য়ুনুস এর ৫৮তম আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন যে মাহবুব (দ.) আপনি বলুন আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও তাঁরই দয়া এবং সেটারই উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত। তা তাদের সমস্ত ধন দৌলত অপেক্ষা শ্রেয়। এ আয়াতে ফারহুন বা খুশী কোন প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তু লাভ করার ফলে অন্তরে যে আনন্দ পাওয়া যায় সেটাকে ফারহুন বলা হয়। এর অর্থ এসে ঈমানদারকে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়ার উপর আনন্দিত হওয়া উচিৎ। যেহেতু তিনি তাদেরকে উপদেশাবালি ও অন্তরের রোগমুক্তি, ঈমান সহকারে অন্তরের সুখশান্তি দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান ও ক্বাতাদাহ্ (র.) বলেছেন যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহ দ্বারা 'ইসলাম' ও তাঁর দয়া দ্বারা 'কোরআন' বুঝানো হয়েছে। অন্য এক অভিমতে ফাদ্বলুন দ্বারা কোরআন এবং 'রহমত' দ্বারা হাদিস শরীফ বুঝানো হয়েছে। ইসলাম, কোরআন, হাদীস সবই আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রিয় নবীয়ে করিম (দ.) এর অপার করুণা, উম্মতের জন্য সুমহান মুক্তি ও শান্তির পরম উপহার উক্ত আয়াত দ্বারা মহান ঈদে আজম ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) উদ্‌যাপনের ইঙ্গিত রয়েছে। এ মহান মাহে রমজান যার সূচনা হতে শেষ পর্যন্ত প্রিয় নবীজির ভাগ্যবান উম্মতের জন্য রয়েছে মহান নেয়ামতে ওজমা বা শ্রেষ্ঠ উপহার- রহমত, মাগফিরাত, ও নাযাত পূণ্যময় রজনী লাইলাতুল কদর প্রাপ্তির সুস্পষ্ট ঘোষণা, সিয়াম-সাধনা, কি সুন্দর প্রকৃতি সেহরী ইফতার সর্বোপরি নুযুলে কোরআন যার বদৌলতে বিশ্ব ভূমণ্ডল আলোকিত আনন্দিত। দীর্ঘদিন সিয়াম সাধনা ইফতার এর আনন্দ। সারারাত ইবাদত, অতিরিক্ত সালাতে তারাবিহ, তাহাজ্জুদ সালাতসহ তাকওয়া অর্জনের কি যেন প্রতিযোগিতা, নেই কোন হিংসা বিদ্বেষ, নেই হানাহানি ছোট বড় সকলের কাছে একটাই প্রত্যাশা, তাক্বওয়া অর্জন, স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন; এসবটাই আল্লাহ্র ফজল অনুগ্রহ রহমত কল্যাণের শ্রেষ্ঠ উপাদান গোটা দিনরাত এসব লাভে ধন্য হয়ে এসবের শুকরিয়াতে মাস শেষে প্রিয় নবীজির নির্দেশ মত মহান ঈদুল ফিতর।

ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ও কষ্টের ইবাদত মাহে রমযানের দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনা পালন করে আবার আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে বিদায় নিতে। জানাতে হবে আলবিদা, সুস্বাগতম হে মাহে শাওয়াল। খুশি আনন্দের কী সুন্দর অপূর্ব দৃশ্য। ধনী-দরিদ্র, আবাল-

হযরত বিবি মা ফাতেমা (র.)

ইসরাত জাহান (ইফা)

রাসূলুল্লাহ্‌র ভবিষ্যদ্বাণী ও স্বীয় মনের প্রবণতার সাহায্যে ফাতেমা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। নির্জন চিন্তা ও বিশ্ব প্রভুর ধ্যানেই এখন তিনি সম্পূর্ণরূপে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিলেন। কাহারো সঙ্গে দেখাশুনা করাও তিনি বড় একটা পছন্দ করিতেন না। এই সময় লোকমুখে খলিফা আবু বকর জানতে পারিলেন যে, নবী নন্দিনী ফিদক মরুদ্যান সংক্রান্ত ব্যাপারে আবু বকরের উপর অসন্তুষ্ট আছেন। তিনি তখনই মা ফাতেমার গৃহদ্বারে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন আর জানাইলেন যে রাসূল কন্যা তাঁহার উপর সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তিনি এ স্থান ত্যাগ করবে না। কিন্তু নবী নন্দিনী ফিদক মরুদ্যানের ব্যাপারে এত সংযত ছিলেন যে, জীবনে কখনো তিনি আর সেই কথা উচ্চারণও করে নাই। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল যে লোকে শুনিলে কী বলিবে যে, নবী কন্যা জমীর দাবি লইয়া খলিফার দরবারে গিয়াছিল। আবু বকর ভুল শুনিয়াছিলেন। নবী নন্দিনী কাহারো উপর অসন্তুষ্ট হইয়া নীরবতা অবলম্বন করে নাই। যে নিরব বরজাখ সীমা তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে তিনি তখন তাহারই শান্তি সর্বাঙ্গ মনে টানিয়া লইতেছিল। এই সময় নবী কন্যার কাছে সর্বদা থাকিতেন আবু বকর এর পত্নী আসমা। নবী কন্যা ছিলেন লজ্জার প্রতিভূ। নবীর এই মহামূল্যবান ভুবনে তিনি আপাদমস্তক সুসজ্জিতা ছিলেন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ্‌র সামনে বসিয়া আছেন। এমন সময় আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মকতুম নামে এক অন্ধ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাহাবীকে দেখিয়া নবী নন্দিনী সেখান থেকে উঠিয়া গেলেন। সাহাবী চলিয়া গেলে রাসূলুল্লাহ্‌কে জিজ্ঞাসা করলেন- "তুমি চলিয়া গেলে কেন?" সেতো অন্ধ। নবী নন্দিনী জবাবে বলিয়াছিলেন তিনি অন্ধ হলেও আমি তো অন্ধ ছিলাম না। হাদীসে বর্ণিত আছে, ফাতেমার লজ্জাধিক্য আল্লাহ্‌র কাছে এত পছন্দনীয় যে, হাশরের দিন তিনি যখন পুলসিরাত আগমন করবেন তখন আল্লাহ্‌র আদেশে এক ফেরেশতা ঘোষণা করবেন- "লোকগণ মাথা নত এবং চোখ বন্ধ কর। মুহাম্মদ কন্যা ফাতেমা এখন পুলসিরাতের উপর দিয়ে বেহেশতে গমন করবে। শেষের দিকে ফাতেমা প্রায় কিসের জন্য যে অস্থির ভাব প্রকাশ করতেন। আসমা বলেন- "একদিন তিনি আমাকে ডাকিয়া বলেন- আমার মনে কেবল একটা চিন্তা অহরহ তোলপাড় করিতেছে। মৃত্যুর পর আমার জানাজা লোকের সামনে রাখা হবে। ইহা বড় লজ্জার কথা। এমনকি কোন উপায় করা যায় না যে ভিন্ন পুরুষে তাহা না দেখিতে পায়? আসমা বলেন, মিশর দেশে আমি দেখিয়া আসিয়াছি স্ত্রী লোকদের জানাজার উপর গাছের নরম শাখা বাধিয়া তদুপরি চাদর ঝুলাইয়া রাখা হয়। ফলে মৃত দেহ আর দেখা যায় না।" তদুপরি নবী কন্যার আগ্রহে আসমা তাহা তৈরি করিয়া দেখছিলেন। উহা দেখিয়া নবীর কন্যা এত বেশি উৎসাহিত হইয়াছিল যে, তাহার ঠোঁটের কোনে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আসমা বলেন- "রাসুলুল্লাহ্‌র পরলোক গমনের পর আর কোন দিন মুখে হাসি দেখা যায়নি। এই সময় একদিন হযরত আলী (রা.) ঘরে আসিয়া দেখেন খাতুনে জান্নাত রুটি তৈরি করিবার জন্য আটার খামির করিয়া রাখিয়াছেন। ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়কে গোসল করাইবার জন্য মাটি ভিজাইয়া রাখিয়াছেন ও তাহাদের কাপড় ধৌত করিতেছেন। হযরত (রাঃ)আলি বললেন, "দুর্বল শরীর লইয়া এত কাজ করার কি দরকার ছিল?"

তখন খাতুনে জান্নাত বলিলেন আর বোধ হয় কাজের সময় পাইব না। আমার যাত্রাকাল সন্নিকট। আমি কাল আব্বাজানকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। আমি যে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, আব্বা আমাকে আপনি ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। আমার যে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। তিনি আমাকে বলিলেন, ফাতেমা আমিও

আবু বকর(রা.) ও হযরত ওমর(রা.) যথেষ্ট দুঃখ করিয়াছিলেন।

হযরত ফাতেমা কোথায় শেষ শয্যায় শায়িত আছেন তাহা লইয়া মতভেদ আছে। কেহ কেহ জান্নাতুল বাকি ছাড়াও "বায়তুল জাহান" বা শোকগৃহ নামক স্থান, ফাতেমার নিজ কুঠার এবং রাসূলুল্লাহ্‌র রওজা মুবারক ও "মসজিদে নববীর" মিম্বরের নিকটবর্তী স্থানকে নির্দেশ থেকে। কিন্তু অধিকাংশের মতে, জান্নাতুল বাকীই খাতুনে জান্নাতের সমাধি ভূমি কথিত আছে, হযরত হাসান(রা.) মৃত্যুকালে ওয়াছিয়াত করিয়াছিলেন যে, তাহাকে যেন মাতামহের রওজা মুবারকের কাছে সমাধিস্থ করা হয়। কিন্তু ইহাতে যদি কাহারো আপত্তি দেখা দেয়, তবে তাঁহার মাতার কবরের পাশে জান্নাতুল বাকীতেই যেন তাঁহাকে দাফন করা হয়। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, খাতুনে জান্নাতের সমাধিস্থান জান্নাতুল বাকীই। এইবার হযরত আলী (রা.) রচিত এক শোকগীতি বা মর্সিয়ার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া বিশ্বের মহামানবের যোগ্য কন্যা খাতুনে জান্নাতের জীবনের কাহিনীর সমাপ্তি টানিতে চাই।

অনেকেই হয়তো জানেন যে, হযরত আলি ছিলেন মুসলিম যুগের এক শ্রেষ্ঠ আরবীয় কবি-

"আমার নসীব মন্দ বলেই
কবর হতে পাইনে সাড়া
নিত্য এসেই সালাম দিলাম,
দাওনী জবাব হে জোহ্‌রা।
দীর্ঘদিনের মধুর স্মৃতি
সব ভুলেছ আজকে বুঝি
(তাই) হৃদয় হারার সালাম শুনেও
নীরবে রও দু'চোখ বুজি।"

আজম মাইজভাণ্ডারী সম্পর্ক যথেষ্ট পরিমাণ সম্মান ও তাঁর সমীপে নিজেই আত্মসমর্পণ করতেন যেমন বর্তমানের ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী (মা. জি. আ.) তিনি হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক.) সম্পর্কে অনেক শান নিজ রচিত তাজ কেরাতুল কেরামে বর্ণনা করেছেন। গাউসুল আজম সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রাদ্বি) নিজেই ঘোষণা করেন-

كسانى خلعة بطواز عزم وتوجنى بتيجات الكمالى

অতি আনন্দের সাথেই আমাকে সর্বোচ্চ গাউসিয়তের ভূষণে ভূষিত করলেন এবং আধ্যাত্মিক সম্রাটের মুকুট হতে একটি আমার মাথায় পরিয়ে দেয়া হল।

হযরত গাউসুল আজম সৈয়দ অব্দুল কাদের জিলানী (রাদ্বিঃ) নিজেই বলেন আল্লাহর রাজ্যসমূহের প্রতি নজর করে দেখি ঐ গুলি আমার হাতের তালুতে রক্ষিত রাই বা সরিষার দানার মতদেখা যায় কারামতে আউলিয়া হচ্ছে মোজেজায়ে আম্বিয়ারই ফসল ইসলামী আক্বিদা মতে কারামতে আউলিয়া হক ও সত্য। মৃত্যুর পরে ও উক্ত কারামত বিদ্যমান থাকে বরং বৃদ্ধি পায় (ইমাম গাজ্জালী)

পরিশেষে আল্লাহপাক ও তাঁর হাবীব সারওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওফিক দান করুন। অলি আল্লাহগণের পদ মর্যাদার ও গাউসুল আজম জিলানী ও গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী সু-নজর আমাদের উপর নসিব করুণ (আমিন)

রেফারেন্স গ্রন্থাবলীঃ- গাউসুল আজম জিলানীর জীবনী বাহজাতুল আছরার, হুজ্জাত মুল মুরিদীন, মসনদে ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী জীবনী আবু দাউদ শরীফ তোহফাতুল আখইয়ার, বেলায়েতে মোতলাকা, তাজকেরাতুল কেরাম, তাজকেরাতুল মাইজভাণ্ডারী, কছিদায়ে গাউসিয়া বাংলাদেশের পীর আওলিয়া।

রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন-

ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مأة سنة من يجدد لها دينها (ابو داؤد - مشكوة)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের জন্য প্রতি শতকের শুরুতে এমন ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন যিনি ধর্মীয় সংস্কারের ভূমিকা পালন করেন (আবু দাউদ ও মিশকাত শরীফ) উক্ত পবিত্র হাদীস অনুযায়ী গাউসুল আজম জিলানী ও গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'লা তাছাউফ গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন। কেননা মুজাদ্দেদের জাহেরী ও বাতেনী যাবতীয় গুণাবলী তাঁদের পবিত্র সত্ত্বায় ছিলেন না। (বিস্তারিত উভয় গাউছুল আজমকে কেন্দ্র করে গবেষকদের অসংখ্য গবেষণা মূলক গ্রন্থাদী) হযরত

গাউছুল আজম সৈয়দ অব্দুল কাদের জিলানী (রা:) যিনি ইরান দেশের অন্তগর্ত জিলান গালান শহরে ৪৭১ হিজরী মোতাবেক ১০৭৭ঈসাব্দে ১লা রমজান সোমবার সোবহে সাদেকের সামান্য পূর্বে জন্ম গ্রহন করেন। পিতা হযরত মাওলানা সৈয়দ আবু সালেহ মুসা জঙ্গী (রহঃ) মাতা সৈয়্যদা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রা:) গাউছুল আজম দস্তগীর পিতা ও মাতা উভয় দিকদিয়ে নবী বংশ ছিলেন বিধায় তাঁর নামের পর আল হাসানী ওয়ালা হোসাইনী বলা হয়। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক:) ও পিতা মাতা উভয় দিকদিয়ে নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর (রহঃ) পিতা সৈয়দ মতিউল্লাহ ও মাতা আবেদাহ জাহেদাহ সৈয়দা বিবি খাইরুন্নেছা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১২৩৩মাঘ ১লা মাঘ রোজ বুধবার জোহরের সময় গাউসুল আজম মাউজভাণ্ডারী (ক:) শুভাগমন করেন তাই বাহারুল উলুম আল্লামা মুফতী সৈয়দ আব্দুল গণি কাঞ্চনপুরী (রহঃ) ঐতিহাসীক আয়নায়ে বারী" গ্রন্থে বলেন -

আব তওয়াললুদ হোগায়ে গাউসে খোদা
ওয়াস্তে তাজীম উনকে হো খাড়া
জিসনে কি তাজীম কু উনুকু কিয়াম
পাচুকা ফাওরান ওয়াহী দিলকা মুরাদ

ভাবার্থঃ গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (রা:) এর শুভাগমন হয়েছে তাঁর সম্মানার্থে দাড়িয়ে যাঁও তাকে দাঁড়িয়ে যিনি সম্মান করেন তিনি মনস্কাম সফল হন। তিনি আরো বলেন-

ছদ মারাহারা সাল্লিআলা গাউসে খোদা পয়দা হোয়ে জানে জাঁহা ওয়া ক্বেবলায়ে আহলে ছফা পয়দা হোয়ে।

ভাবার্থঃ- পৃথিবীর সমগ্র সৃষ্টি বলতে লাগলে মারহাবা ইয়া মারহাবা গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী মারহাবা আল্লাহর বন্ধু পৃথিবীর প্রাণ আল্লাহ ওয়ালাদের দিক নিদের্শনা দানকারী ইমাম ভবে তাশরীফ এনেছে । এবং তখনকার যুগের হযরত বাহারুল উলুম আল্লামা মুফতি সৈয়দ আব্দুল গণি কাহঞ্চণপুরী (রহঃ) ইমামে অহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীনে মিল্লাত আল্লামা সৈয়দ আজিজুল হক প্রকাশ ইমাম শেরে বাংলা (রহঃ) ও হযরত ইমামূল মুহাক্কেক আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রহঃ) মাওলানা বজলুল করীম মন্দাকিনি মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) মাওলানা আব্দুল হাদী মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) সহ শীর্ষ স্থানীয় আলেমগণ সহ হযরত গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক:) এর ইলম ও আধ্যাত্মিক শক্তির কাছে হার মেনে নিয়েছেন এবং নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়েছেন কেননা গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (রা.) তৎকালীন সময়ে ১২৭০ হিজরীতে মসলকে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা মাটিয়া বুরুজে মুন্সী বোয়ালী (রহ) মাদরাসায় বিজ্ঞ মুদাররেস হিসেবে ইসলামের খেদমতে আত্মানিয়োগ করেন এখানে দীর্ঘ দিন শিক্ষাদানের পর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সবোর্চ্চ শিক্ষা কেন্দ্র কলকাতা আলীয়ে মাদরাসার দক্ষ মুহাদ্দেছের প্রয়োজন হওয়ার তৎকালীন ওখানকার সবার বিশেষ অনুরোধ বোয়ালী মাদরাসার দায়িত্ব ছেড়ে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় মুহাদ্দেছে হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

ইমামুত ত্বরীক্বত' গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (রা:)

মুহাম্মদ হাসান [বি.এ. (অনার্স) এম.এ.]

ভূমিকা : বিশ্ব আলমের ত্রাণকর্তা হিসাবে রাসূলে খোদা (দ:) বেলায়েত ওজমার তাজ পরিধান করে বেলায়েত মোতলাকায়ে আহমদীর প্রবক্তা ও সার্বজনীন মুক্তি বাণী নিয়ে এই বাংলার জমিনে তাশরীফ এনেছিলেন, হুজুর গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী মাওলানা শাহসুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)। যিনি শুধু একজন গাউছিয়ত মকামের অধিকারী অলিই নন, তিনি একাধারে জগত বিখ্যাত হাদিস বিশারদ, মুফাস্সীরে আজম, মুফতিয়ে আলম। তাঁর পবিত্র রওজা শরীফের উপরি ভাগে কোরানুল করীমের বিভিন্ন সুরার বিভিন্ন আয়াত সমূহকে দৃষ্টি নন্দনভাবে সুসজ্জিত করে সন্নিবেশন করা হয়েছে। যা আশেক ভক্তের হৃদয়ে এক নতুন মাত্রার যোগ করেছে। ১৮২৬ সালে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির মাইজভাণ্ডার গ্রামে জন্মগ্রহণ করে স্বীয় কামালিয়তের কল্যাণে শহর থেকে ২৪ মাইল দুরে অবস্থিত একটি সাধারণ গ্রামকে উপমহাদেশের অন্যতম প্রধান অধ্যাত্ম মিলনকেন্দ্র হিসাবে পরিচিতি বিনির্মাণের অবকাশ তৈরী করেছেন। ১৯০৬ সালের ২৩ জানুয়ারী মোতাবেক ১০ মাঘ তারিখে তিনি ওফাত বরণ করেছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর ওফাতের এইদিন তথা ১০ মাঘকে কেন্দ্র করে অধ্যাত্ম পরিমণ্ডলে যে ধারা প্রবল গতিলাভে সমর্থ হয়েছিলো তার প্রভাবে আজ সারাদেশে ওলীয়ে কামেলীনদের কল্যাণকর অবদান সমূহ স্পষ্টতর হওয়ার সুযোগ লাভে সমর্থ হয়েছে। ২০০৬ইং সনে গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারীর ওফাত শতবার্ষিকী স্মরণে ১৯৯৯ সাল থেকে শত বছরের প্রাচীন কাঠামো ভেঙ্গে রওজা-এ-পাক পুনঃনির্মাণের যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিলো ২০০৬ সালে সফলতার সাথে সেই কার্যক্রম যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছিলো। পুনঃনির্মিত রওজা-এ-পাকের কাঠামোর উপরিভাগে পাঁচটি খোলা কোরানের স্থাপত্য ব্যবহারের মোটি ১০টি কোরানের আয়াত-ও নান্দনিক কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে সংযুক্ত করে দর্শকদের জন্য উন্মোচিত করা হয়েছে। বস্তুতঃ প্রতিটি সংকলিত আয়াত শানে রেসালত ও শানে বেলায়তের সাথে সম্পর্কিত রয়েছে। উক্ত দশটি আয়াতের মর্মবাণীর সাথে গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারীর কোন না কোন কালাম বা হেদায়ত বাণীর সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। তাই সেই সমস্ত আয়াতে করীমা গুলো প্রায়শই হুজুর গাউসুল আজম (ক:) উচ্চারণ করতেন। সেই সমস্ত আয়াতে করীমাগুলোর সহিত তার কালামে মোরাবকের একটি সাদৃশ্য দেখা যায়। তাঁর বিভিন্ন কালাম মোবারকের গাউছে মাইজভাণ্ডারীর গোলামিয়ত ও তিনি জগতবাসীকে নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দানের লক্ষে কোরআনুল করীমের ইঙ্গিত দিতেন। বর্তমান নিবন্ধে গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর রওজা-এ-পাক এর উপরিভাগে সন্নিবেশিত ১০টি আয়াতের করিমার সহিত তাঁর কালাম বা বাণী সমূহের দিগ নির্দেশনা গুলো খেদমতের অংশ হিসাবে তুলে ধরায় প্রয়াস নিয়ে গাউছে মাইজভাণ্ডারীর গোলামিয়ত হাসিলের উদ্দেশ্যে পাঠক ও আশেক ভক্তের জন্য প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।]

অনুবাদঃ নিয়ম তাদেরই যাদেরকে আপনার পূর্বে রাসূল হিসাবে আমি প্রেরণ করেছি। আর আপনি আমার নিয়মকে পরিবর্তনশীল পাবেন না। নামাজ কায়েম করুন সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত ও ভোরের কোরান তেলাওয়াত। নিঃসন্দেহে ভোরের কোরানের মধ্যে ফেরেস্তারা উপস্থিত হয়। এবং রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করুন। এটা নির্দিষ্ট আপনার জন্যই। এই কথা নিকটে যে আপনার প্রভু আপনাকে এমন এক স্থানে দাঁড় করাবেন যেখানে সবাই আপনার প্রশংসায় রত থাকবে এবং এভাবে আরজ করুন, "হে আমার প্রভু আমাকে সঠিকভাবে প্রবেশ করাও ও সঠিকভাবে বাহিরে নিয়ে যাও এবং আমাকে আপনার কাছ থেকে সহযোগিতাকারী বিজয় শক্তি দাও"। আর আপনি বলুন,'সত্য এসেছে ও মিথ্যা দুর হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হবারই কথা।

মূল আহবান ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণঃ উক্ত আয়াতগুলো দ্বারা নামাজ আদায় ও কোরান তেলাওয়াতের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এবং নবী করিম (দ:) কে মক্কামে মাহমুদ অধিষ্ঠিত করার মাধ্যমে সকল নবী রাসূলগণের সর্দারে ভূষিত করা হয়েছে। এবং এখানে বলা হয়েছে যে, 'আপনার উপর অতিরিক্ত হিসাবে তাহাজ্জুদের নামাজ ফরজ করা হলো'। এবং অধিকাংশ মুফাস্সিরের অভিমত যে, উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য এ নামাজ সুন্নাত। ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে হযরত গাউসূল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক:) 'আরেফবিল্লাহ'ছায়েরে মা'আল্লাহ: তাই তিনি আহকাম তথা খোদা-রাসূল প্রাপ্তির পথ সমুহের পথ নির্দেশক। কেননা আল্লাহতায়ালা তাঁর এই সমস্ত প্রিয় বন্ধু দ্বারা নিজের পরিচয়ের প্রকাশ-বিকাশ ঘটান। মিথ্যা সর্বদা বিদুরিত হয় এবং সত্য তথা খোদা তায়ালার দর্শন রূপ সর্বদা সূর্যের মত স্পষ্টই থাকে। দ্বীনকে শক্তিশালী করার জন্য খোদা তায়ালার সাহয্যে কামনায় আউলিয়া কেরামগণ সর্বদা রত থাকেন।

খোদা তায়ালার ইয়াদগারী করার প্রক্রিয়াগুলো আরেফ বিল্লাহ হিসাবে সুরতে মোহাম্মদী জিন্নে নবুয়ত-ছিররে রেসালত হিসাবে গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক:) জগতবাসীকে প্রদর্শন করেছেন। এবং সত্যকে সত্য বলার, মিথ্যাকে মিথ্যা বলার অর্থাৎ সত্য-মিথ্যাকে যাচাই করার প্রয়োজনীয় দীক্ষাগুলো দান করে অন্তর্জ্ঞান কে পরিশুদ্ধ করান। কারণ মিথ্যার মধ্যে খোদার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। সে জন্য যারা নবী-রাসূল ও আউলিয়ায়ে কামেলীনদের পথ অনুসরণ করেন তারা শত্রুদের উপর সর্বদা বিজয় লাভ করেন। সেটা আল্লাহ তায়ালার পক্ষথেকে এক মহা নেয়ামত। খোদা তায়ালার দর্শন লাভের যে প্রক্রিয়াগুলো হযরত গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক:) প্রদর্শন করেছেন, সেগুলো সুরা বনী ইস্রাঈলের উল্লেখিত আয়াত গুলোর মূল দর্শন। আল্লাহ তায়ালার ওলীগন যাহা বলেন, মূলত সেটা খোদা তায়ালারই বার্তা। তাই মিথ্যা যেমন চিরস্থায়ী নয় তেমনিভাবে চির সত্য দর্শন সমূহ যাহা ওলীগন প্রদর্শন করেন তাহাও সূর্যের মত সর্বদা চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। যেমন গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক:) মানব জাতিকে খোদামুখী করার নিমিত্তে বিভিন্ন হেকমত অবলম্বন করেছেন। যার মধ্যে অন্যতম একটি হলো "গাউছিয়ত নীতি' যেটা অছিয়ে গাউসূল আজম (ক:) সংকলনপূর্বক প্রণয়ন করেছিলেন। মূলত: সেটি হযরত আকদাছের (ক:) দর্শনের প্রতিফলন। আর একটি হলো জিকিরে সা'আ যা মানবাত্মাকে সমস্ত কামনা বাসনা থেকে ভুলিয়ে পরমাত্মায় উন্নিত করে। তাহাজ্জুদের নামাজের শিক্ষা দিয়ে তিনি সুন্নাতে মোহাম্মদীর পাবন্দী করার তাগিদ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার দরবারে যেটা ফরিয়াদ কবুলের অন্যতম উপলক্ষ। সুতরাং যারা খোদা তায়ালাকে হাসিল করার নিমিত্তে ওলীয়ে কামেলীনদের প্রদর্শিত পন্থায় জীবন পরিচালনা করবে তারা সফলকাম হবেন তথা মঞ্জিলে মকছুদে পৌছতে সক্ষম হবেন। আর যারা অমান্য করবে তারা পথভ্রষ্ট হবে অর্থাৎ আল্লাহ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে। মুলত: সেটা তাদের জন্য এক ভয়াবহ পরিস্থিতি।

উক্ত আয়াতগুলোর আলোকে উল্লেখযোগ্য কালামে গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারীঃ

"তাহাজ্জুদের নামাজ পড়িও, কোরান তেলাওয়াত করিও , নিজ সন্তান-সন্ততি নিয়া খোদা তায়ালার প্রশংসা করিও।" (চলমান)

গুলো জীবিত ও মৃত উভয়ের কল্যাণের জন্য ফরিয়াদের মাধ্যমে তথা আল্লাহর দরবারে মুনাজাতের মাধ্যমে পেশ করা হয়,

বুঝাগেল(ক)

বণী আদমের সমস্ত মৃতদের উদ্দেশ্যে খতমে কোরআন জিকির মাহফিল মিলাদ শরীফ সর্ব নিম্ন এগার বার সুরা এখলাস শরীফ পাঠ করা মৃতদের আত্মা সমূহে সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য যথেষ্ট

(খ) আবার বৃহত্তর কীর্তি হিসাবে সমজিদ, মদ্রাসা,এতিমখানা, স্কুল, কলেজ, রাস্তা-ঘাট, পুকুর-কূপ খনন প্রভৃতি সাদকায়ে জারিয়া রূপে এবং (গ) অস্থায়ী কীর্তি (সৎকর্ম) মৃতদের উদ্দেশ্যে মেহমান দারী রূপে গন্য হয়। তার সওয়াব দ্বারাও মৃতদের আত্মা সন্তুষ্ট হয়ে থাকে। মুনাজাতের মাধ্যমে মৃতদের মাগফিরাত ও কামনা করা হয়।

(তিন) সুন্নী মুসলসমানেরা সচরাচর বিভিন্ন পীর আউলিয়াদের ওরশ ফাতেহার আয়োজন করে থাকে যেমন রবিউল আউয়াল মাসে ঈদে মিলাদুনবী(দ:) মাহফিল ও মহররম মাসে রবিউলমসানিতে ফাতেহা ইয়াজ দাাহুম বজর মাসে ফাতেহায়ে খাজা বাবা (রা) রমজান মাসে ফাতেহায়ে সাহাবায়ে বদর ভদ্র মাসের চৌদ্দ তারিখে ফাতেহায়ে খোয়াজ খিজির (আ) মাঘ মাসে মাইজভণ্ডারী ওরশ শরীফ সহ ভক্ত গণের মাধ্যমে বিভিন্ন আউলিয়াদের ওরশ ফাতেহা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাছাড়া ঘরে ঘরে মৃত মা-বাবা, দাদা-দাদী, নানা-নানী শ্বশুর-শ্বাশুরী মুরুব্বীদেরও ফাতেহার আয়োজনে হয়ে থাকে। উক্ত সাদকাসমূহের (দান টাকা পয়সা ব্যয়) সওয়াব মৃতদের রুহে পৌছে তা আমরা হজরত সা'দের (রা:) কূপ খননের হাদিস হতে জেনেছি সওয়াব মৃতদের রুহে পৌছল তাদের অবস্থা কিরূপ হয় তাও আমরা অন্য একটা হাদিস শরীফ থেকে জানতে পারি। তা হচ্ছে হজরত আনাস (রা:) হজরত দোয়া প্রার্থনা করি। সেগুলোর সওয়াব তাদের নিকটে পৌছে কিনা?" নবী করিম (দ:) ইরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে পৌছে। আর তারা তা পেয়ে এতই খুশি হয় যেভাবে তোমাদের কেহ উচ্চ মানের ও পছন্দনীয় তোহফা পেয়ে জীবিত লোকের খুশী হয়ে থাকে " (আলহাদিস) বুঝা গেল মৃত মা বাবা আত্মীয় স্বজনদের উদ্দেশ্যে মসজিদ মাদ্রাসা এতিমখানা প্রভৃতিতে ব্যয় করা যেমন তাদের খুশীর কারণ হয়। পীর আউলিয়া বুজুর্গদের নামে মসজিদে মাদ্রসার নামকরণ করা এবং তাদের নামে ওরশ ফাতেহা কোরবানী করাতে তাদের আত্মা সমূহে জীবিতদের ন্যায় খুশী হয়ে থাকে " আউলিয়াগণ যেহেতু অমর (আলহাদিস) তারা যেহেতু জীবিতদের ন্যায় খুশী হয় তাই তারা আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিতে জীবিতদেরকে জীবিতদের ন্যায়ই সাহায্য করে থাকে। মৃত মনের স্তর সবাই এক রকম নয় যারা আল্লাহর প্রেমে ফানা আউলিয়া বন্ধুশ্রেণীর বান্দা তাদের সম্মানে সকাল সন্ধ্যায় রিজিক পৌছানো হয়। কিছু বান্দা কবর জগতে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে কিছু বান্দা কবরে অবস্থান পূর্বক জান্নাতের দৃশ্যাবলী অবলোকন করতে থাকে আবার কিছু বান্দা সাপ্তাহিক জুমা রাতে মুক্তি পেয়ে সওয়াবের আশায় আত্মীয় স্বজনদের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ায়। মানবজনম তখনই সার্থক যখন মানবজাতি তাদের সুনামের সাথে স্মরণ করে থাকে। মানবজাতি পীর আউলিয়াদেরকে সচরাচর বাবা শব্দ দ্বারা অভিহিত করে থাকে। যেমন বাবা খোয়াজ খিজির বাবা শাহ জালাল, বাবা ভাণ্ডারী, বাবা গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী, বাবা আদম শহীদ, বাবা বদর পীর, খাজা বাবা, জিয়া বাবা, (রাহমাতুল্লাহি আলাই হিম)। এখানে বাবা অর্থ জন্মদাতা পিতা নয়। বাবা শব্দটি এসেছে তুর্কী ভাষা হতে তুর্কী ভাষায় পীরকে 'বাবা' শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হয়। সুতরাং সুফীবাদের অনুকরণে বাবা শব্দ দিয়ে পীর বুঝানো হলে তখন বাবা খোয়াজ খিজির মানে হবে পীর খোয়াজ

জন্য নামাজ পড়া, রোজা রাখা, হজ্ব করা, উমরা করা, কুরবাণী করা, দান সদকা করা, তাদের নামে মসজিদে মাদ্রসা পুকুর কূপ তৈরী করা প্রভৃতি। সদকায়ে জারিয়া হয় নেককার সন্তানাদি রেখে যাওয়া আলেমের পক্ষে কিতাবাদী রচনা করে যাওয়া এবং ধনীদের পক্ষে মনের কল্যাণ করা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাওয়া। সুফীবাদে আউলিয়া বুজুর্গদের রীতিতে "ফাতেহা শরীফ" হচ্ছে সর্ব যুগের জন্যই সার্বজনীন সদকায়ে জারিয়া। প্রতিটি যুগেই মুসলিম প্রজন্ম দুনিয়াতে আসবে। তারা আল্লাহর ওয়াস্তে নেককার বদকার সবাইকে 'ফাতেহা শরীফ' পদ্ধতির মাধ্যমে মানব জাতিকে প্রতি যুগেই স্বরণ করে যাবে বণী আদমের মধ্যে "নবীয়ীন সিদ্দিকীন শোহাদায়ি সালেহীন " নামে চারটি নেককার বান্দার স্তর রয়েছে। যারা আখেরাতে উজ্জ্বল নক্ষত্রতুল্য বান্দা। তাদের সাথে রুহানী সর্ম্পকে দুনিয়াতে সৃষ্টি করতে পারলে আখেরাতের চির স্থায়ী জগতে তার বাস্তবতা প্রতিষ্ঠিত হবে। আবুলাহাব, আবু জেহেল, এজিদ, নমরুদ, ফেরাউনকে ইহজগতে ঘৃণা করলে আখেরাতে তারা বেদকার সুফি বান্দা থেকে দূর থাকবে। কিন্তু "নবীয়ীন সিদ্দিকীন শোহাদায়ি সালেহীন সম্প্রদায়কে ওরশ ফাতেহা পদ্ধতির মধ্যেম স্মরণ করলে আখেরাতে তারা স্মরণকারীর বন্ধু হবে। তারা দুনিয়া আখেরাতে আল্লাহর নেয়ামত প্রাপ্ত বান্দা। তাদের স্মরণে সদকায়ে জারিয়ার ওরশ ফাতেহার কুরবাণী ইবাদতের সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারলে দুনিয়া ও আখিরাতে মানব জাতি নিঃসন্দেহে কামিয়ার হবে। কুরআনের বাণী হচ্ছে "ফাজ কুরুনী আজ কুরুকুম"অর্থাৎ আমাকে স্মরণ করলে আমিও স্মরণ করব সুতরাং যারা সিরাতাল মুস্তাকিমে প্রতিষ্ঠিত তাদের স্মরণ করলে মানবজাতি গোমরাহ হয় না।"

(পাঁচ) মৃত আপনজনদের উদ্দেশ্যে সওয়াবের জন্য তাসবীহ তাহলীল জিকির আজকার পাঠ করা যায়। স্বজনদের মৃত্যু পর পর তাহলীল খতম করতে প্রায় দেখা যায়। কিন্তু ওফাত পরবর্তীতে কেবল বাৎসরিক ফাতেহা ব্যতীত আর তেমন কিছু করতে দেখা যায়

নামাজ পড়া রোজা রাখা দান খয়রাত করা প্রভৃতি কষ্টসাধ্য ও ব্যয় সাপেক্ষ হয় ও নিয়ত আমলটি পাঠকারীর জন্য খুবই হালকা। মেহনত ও কষ্ট সাধ্য নয়। যে কোন গরীব ধরণের নর নারীদের জন্য এটা সহজ সাধ্য আমল। যা পালনের মাধ্যমে মৃতদের রুহে সওয়াব পৌঁছানো সহজ হয়। আর এ আমলটি হলো "বিসমিল্লাহ শরীফে" তেলাওয়াত করা। হজরত পীরানে পীর বড় পীর (রা:) একটি হাদিস শরিফ বর্ণনা করেছেন যে "ইসমে আজমের সাথে বিসমিল্লাহ শরীফের এর সম্পর্কে এত কাছাকাছি যেরূপ চোখের কালো অংশের সাথে সাদা অংশের সর্ম্পক যত কাছাকাছি" হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) হতে বর্ণিত যে "একবার বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠ করলে পাঠকারী দশ হাজার নেকী দশ হাজার গুনাহ ক্ষমা এবং দশহাজার মর্তবা (পদবী) প্রপ্ত হয়"। (আল হাদিস) বিসমিল্লাহ শরীফে মূলত: তিনটি আল্লাহর নামে রয়েছে। তিনটি নাম হচ্ছে আল্লাহ রহমান ও রহিম। তিনটি নামের বরকতে তিন ধরনের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। বিসমিল্লাহ শরীফে "ইসম আল্লাহ রহমানও রহিম" এ চারটি শব্দ রয়েছে। বিসমিল্লাহ শরীফ ১৯টি বর্ণ রয়েছে। যদি চারটি শব্দকে ১৯ সংখ্যা দ্বারা গুণ করা হয় তখন ফলাফল হয় ৭৬। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত যে "একবার বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠ করলে পাঠকারী ছিয়াত্তর হাজার নেকী ছিয়াত্তর হাজার গুনাহ ক্ষমা এবং ছিয়াত্তর হাজার মর্তবা প্রাপ্ত হয় "সুবহানল্লাহ। সুতরাং কমপক্ষে দৈনিক কিংবা সাপ্তাহিক বৃহস্পতিবার জুমারাতে মৃত আপনজনদের স্মরণে কমপক্ষে ১০০ বার বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠ করে সওয়াব রসানী করে দিলে ও মৃত কবরবাসীগণ অনেক ফজিলতের অধিকারী হয়। ওয়াহাবী সম্প্রদায়'ফাতেহা' অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিজেদের মনোভাব পরিবর্তন করে নিলে সুন্নি মুসলমানদের ন্যায় তারাও মৃত সমস্ত কবর বাসীদের উপকার করতে সক্ষম হতো (আস সালাম)।

ও মুর্শিদে বরহক অছিয়ে গাউসুলআজম হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (ক.) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে শাহ্‌সূফী সৈয়দ মুনিরুল হক (রহ.) অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। একই ধারায় ১৯৬৯ সালে 'আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারীর' গঠনতন্ত্র রচনা করার জন্য সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, সেই উদ্যোগ বাস্তবায়ন, সাংগঠনিক বিধি-বিধান তৈরী করে গঠনতন্ত্র মুদ্রণপূর্বক প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিলো স্মরণীয়। সেই গঠনতন্ত্রের বিধি বিধান মোতাবেক অছিয়ে গাউসুলআজম নিজ হস্তে গঠনতন্ত্র রচনা করতঃ মহান দরবারে গাউসুলআজমের 'মোন্তাজেম' হিসাবে আলহাজ্ব শাহ্‌সূফী সৈয়দ মুনিরুল হক (রহ.) কে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভাপতি মনোনয়নপূর্বক সংগঠনের দায়িত্বভার তাঁর উপর অর্পন করে গিয়েছিলেন এবং সেই গঠনতন্ত্রের অনুকূলে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুর্শিদের হুকুমতের বরাবরে মহান দরবারের খেদমদাদি আঞ্জামের সহিত সংগঠনের এই গুরু দায়িত্ব বহন করেছিলেন এবং তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে সমগ্র দেশে এই সংগঠন ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছিলো। তিনি গভীর নিষ্ঠা ও আধ্যাত্মিক মতায় মহীয়ান ছিলেন।

আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে যুক্ত হওয়ার কারণে হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (রহ.) কে অছিয়ে গাউসুলআজমের গদীতে বসিয়ে তৎপরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে তাঁর অবস্থার পরিপ্রেতিতে মসজিদ পুকুরের উত্তর দিকে নিজস্ব বাগান বাড়িতে পাকা দালান, স্যানিটারী লেট্রিন ইত্যাদির সুব্যবস্থা করে পৃথকভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই সাথে তদীয় ২য় পুত্র সন্তান আলহাজ্ব শাহ্‌সূফী সৈয়দ মুনিরুল হক (রহ.) কে গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারীর হুজরা শরীফে অছিয়ে গাউসুলআজমের গদী শরীফে পীরি তরিকতের দায়িত্ব প্রদানের জন্য চাহিলে তিনি মোন্তাজেমে দরবারের দায়িত্ব পালনে ভারাক্রান্ত এবং ব্যস্ততায় আছেন বলিয়া সবিনয়ে সেই প্রস্তাব থেকে নিজেকে মুক্ত করার প্রস্তাব ব্যক্ত করেন। যেহেতু তিনি মোন্তাজেম হিসাবে দরবারের সার্বিক বিষয়ে যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব হিসাবে বিভিন্ন খেদমতাদি আঞ্জাম দিয়ে চলেছেন।

তাঁর খেদমতের নির্দিষ্ট কোন পরিধি বর্তি হয়নি। মুনিবের শানে আজমতের বরাবরে তিনি সর্বদা ছিলেন একাগ্রচিত্তে সুবিনীত, সুমিষ্টভাষী, সদালাপী ও ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক। সূর্যের প্রখরতা নয়, চন্দ্রের স্নিগ্ধ আলো যেমন পথ হারা পথিককে পথের দীশা দেয়, তেমনি তিনি পরোক্ষভাবে অন্তরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মাধ্যমে কশফে এলাহী বাতেনকে আশেক ভক্তকে মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছার উপল তৈরীতে এক মহা কারিগর বটে নিশ্চয়। পুত্র কিংবা আওলাদ হওয়ার যোগ্যতাবলে নয়, বরং স্বীয় সততা, একাগ্রতা, বিনয়ী ও খাঁটি যোগ্য পাত্র হিসাবে তিনি অছিয়ে গাউছুলআজম হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক:) নিকট প্রিয় পাত্র হিসাবে সমাদৃত ও গ্রহণ যোগ্যতা পেয়েছিলেন। পবিত্র কোরআনুল করীমের সুরা আনফালের ৩৪নং আয়াতের তথ্য মতে আল্লাহ তায়ালার ওলীগণের যে গুণাবলী ছিল, তা বাস্তবে পরিলতি হয়েছে হযরত শাহ্‌সূফী সৈয়দ মুনিরুল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক:) জীবন দর্শনে। দরবারে পাকের খেদমতের প্রারম্ভে যে ইচ্ছা, প্রেরণা ও নিসবত নিয়ে ধারা বাহিকতার সূত্র তৈরী করেছিলেন, আমৃত্যু সেটাকে নিজের মধ্যে ধারণ করে মুনিবের শোকর গুজারীতে সদা-সর্বদা অটল ছিলেন। মোন্তাজেমে দরবার হিসাবে দরবার পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন কার্পন্যতা, দূর্বলতা এমনকি প্রশাসনিক কর্মকান্ডে কোন শিতীলতা তাঁর দর্শনে পরিলীত হয়নি। যিনি যতটুকু হকের অধিকারী তাকে ততটুকু প্রদান করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার কুণ্ঠাবোধ তাঁর মধ্যে নিহিত ছিল এমন কিছু কোন

অত্যন্ত সহনশীল ও সাফল্যের সাথে সুসম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দরবারে পাকে আগত ভক্ত-জায়েরীগণ তাঁর দর্শন ও আলাপ চারিতার মাধ্যমে প্রকৃত শরাফত চর্চায় ব্রতী হতো তার অমীয় নির্দেশনাবলীর অনুবলে। খেদমত, সোহবত, মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ ঘটান তিনি অত্যন্ত সুচিন্তিত মতামত ও বিচণতার সাথে। সমাজসেবা ও আর্ত মানবতার সেবায় নিয়োজিত এই মহান ব্যক্তিত্বের সার্বিক সহযোগিতায় সংগঠনের উদ্যোগে দরবারেপাকে প্রথম চক্ষু শিবির আয়োজন করেছিলেন ১৯৮৬ সালে।

অছিয়ে গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) বেছাল শরীফ উপলে ১৯৮৭ সালে ২০শে রবিউল আউয়াল তারিখে মাইজভাণ্ডারর দরবার শরীফে সমস্ত আশেক-ভক্তদের উন্মুক্ত পরিবেশ পালনের নিমিত্তে ঐতিহাসিক জসনে ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.)'র সূচনা হয়েছিলো তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে। অদ্যাবধি সেই জশনে ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসাবে ২০ রবিউল আউয়াল আশেক-ভক্ত ও অনুরক্তের নিকট এক আনন্দময় খুশির দিন হিসাবে সমাদ"ত। এই শানদার মাহফিলে শরীয়ত তরিকত, হাকিকত, মারেফাতের আলোচনার মাধ্যমে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের শরাফত সম্পর্কে জনসাধারণ অবগত হয়ে থাকেন।

সংগঠনের সমগ্র বাংলাদেশসহ বহির্বিশ্বে সদস্যদেরকে সকল সাংগঠনিক কর্মকান্ডে উৎসাহিত করে মুনিবের শান আজমতকে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছিলেন আলহাজ্ব শাহ্সূফী সৈয়দ মুনিরুল হক (ক.)। ১৯৬৯ সালের রচিত গঠনতন্ত্রটি সংশোধিত আকারে ১৯৯১ সালে কাউন্সিল অধিবেশনে অনুমোদিত গঠনতন্ত্র প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে তিনি মূল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সকল প্রকার কর্মকান্ডে সমগ্র শাখা-সংগঠন তাঁর মেহেরবাণীতে সয়লাব হতো। যখন কোন বিপদগ্রস্ত মানব তাঁর সোহবতে যেতেন তাকে বলতেন মুনিব মেহেরবান। সর্বদা মুনিবের শান আজমতেকে তুলে ধরেছিলেন অকপটে। নিজের হাস্তীকে বিলীন করে তিনি যে অন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা পৃথিবীতে খুব কম সত্ত্বাই অর্জন করতে পেরেছেন।

হযরত গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার নিমিত্তে ওফাত শতবার্ষিকী স্মরণে রওজা শরীফকে আকর্ষণীয় স্থাপনা ও মুগোপযোগী কাঠামোতে এক অসীম 'আল কোরানের নকশা আঁকা' পবিত্র রওজা শরীফের নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোদন করেছিলেন আলহাজ্ব শাহসূফী সৈয়দ মুনিরুল হক (ম.)। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে রওজা শরীফের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল অত্যন্ত এক আনন্দঘন পরিবেশে এবং নির্মাণ পরিকল্পনা থেকে শুরু করে আর্থিক কাঠামো নির্মাণ ও বাবস্থাপনা সকল কিছু তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন সুনিপুনভাবে।

হযরত গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) ওফাত শতবার্ষিকী স্মারক প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিষদ গঠনপূর্বক এই উপলকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের মাধ্যমে স্মরণীয় করে রাখার নিমিত্তে ১৯৯৯ সালে যে কমিটি গঠন হয়েছিলো আলহাজ্ব শাহ্সূফী সৈয়দ মুনিরুল হক চেয়ারম্যান হিসাবে অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সমস্ত খেদমদাদি আঞ্জাম দিয়েছিলেন। ২০০৪ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ২রা পৌষ গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারীর ঐশী আলোকে আলোকিত ব্যক্তিত্ব খোলাফায়ে এজামদের আওলাদবৃন্দকে একত্রিত করে প্রতি বৎসর ২৭ জিলক্বদ 'আওলাদে খলিফায়ে গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারী সম্মিলনী' কার্যক্রম তিনি সূচনা করেছিলেন। অদ্যাবদি তা পালন হয়ে আসছে। সর্বোপরি ২০০৫ সালের মধ্যে গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) রওজা শরীফের সকল কাজ সম্পন্ন করার জন্য তিনি সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় ২০০৫ সালের ৮ই জানুয়ারী চট্টগ্রাম লালদীঘির ময়দানে স্মরণাতীত কালের ঐতিহাসিক 'শানে বেলায়ত সুন্নী সম্মেলন' অনুষ্ঠান তিনি শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেছিলেন। হযরত গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারী (ক.), হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.) এর আওলাদেপাকসহ খোলাফায়ে গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারীর আওলাদবৃন্দ উক্ত ঐতিহাসিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন ন আশেক ভক্তের পদচারণায় লালদীঘি ময়দানে এক আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিলো। সেই সাথে ১৪

মানব মহামানবে তখনই পরিনত হয় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সকল সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে। তার চরিত্র বিশ্বজনীন মানবিক চরিত্র পরিগঠনে জীবন্ত শক্তি ও মডেল রূপে পরিগনিত হয়। আমিরে মোস্তাজেম আলহাজ্ব শাহসুফি সৈয়দ মুনিরুল হক মাইজভাণ্ডারী ছিলেন তেমনি একজন মহামানব, যার মানবতার স্বরূপ আমার মত নগন্য গোলামের পক্ষে বর্ননা করা অসম্ভব। তবুও সশ্রদ্ধচিত্তে স্বরন করার নিমিত্তে কিছু কথা নিবেদন করার জন্য এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। আলহাজ্ব শাহ সুফী সৈয়দ মনিরুল হক মোস্তাজেম কে আমি পেয়েছি আমার কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে থেকেই। আমার জীবন একজন আদর্শ অভিভাবক হিসাবে তাঁকে পেয়ে আমি গর্বিত। আল্লাহর অলি যে একজন প্রকৃত অভিভাবক তার পরিচয় আমি তার থেকে পেয়েছি। ১৯৬৫ সাল থেকে দরবারের পাকের খেদমতে খাদেমুল ফোকরা অছি-এ গাউছুল আজমের নির্দেশিত পথে মতে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগে গোলামীতে নিয়োজিত ছিল বিধায় তিনি আমির মোস্তাজেম মর্যাদায় আসীন হয়ে ছিলো। তার চিন্তা, চেতনায় সর্বদা অছি-এ গাউছুল আজমের আর্দশ বিরাজ করিত। আর বলতেন "ব্যাক্তি নয় নীতিই শক্ত ভিত্তি"। আমাদের কে উপদেশ দিতেন মনিবের খেদমতে গোলামী করাতে, আত্মনিয়োগ করাতে, মুক্তির পথ, শান্তির পথ, কল্যানের পথ। সঠিক ভাবে যারা গোলামী করেছেন, মুনিব তাদেরকে মেহেরবানী করেছেন। দয়া করেছেন ক্ষমা করেছেন এবং তাদের জীবন সার্থক সুন্দর ধন্য হয়েছেন। মুনিবের সন্তুষ্টি অর্জনে গোলামীই হচ্ছে সর্বোত্তম উসিলা। অছি-এ গাউছুল আজম যেমন হযরত আকদাসের নবাব সোলতান, দেলা ময়না, বাদশাহ। অছি হয়েও নিজেকে খাদেমুল ফোকরা পরিচয়ে খেদমতে চালিয়ে যেতেন। ঠিক তেমনি ভাবে আমিরে মোস্তাজেম অছি-এ-গাউছের শাহজাদা হওয়া সত্তেও গোলামীয়তের জিম্মাদারীর দায়িত্ব ভার গ্রহন পূর্বক গোলামী কি এবং কেন, তার গুরত্ব তার জীবনের প্রতিটি মূহর্তে প্রতিষ্ঠা করে আশেকানে পাউছে মাইজভাণ্ডারী ভক্ত, অনুরক্ত, অনুসারীদেরকে জানান দিয়ে গেছেন। তাই তিনি আমাদের মাঝে আদর্শের অনন্য প্রতীক এবং মাইজভাণ্ডারী দর্শনের এক অপরূপ উজ্জল দৃষ্টান্ত। খাদেমুল ফোকরা অছি-এ গাউছুল আজমের প্রদর্শিত আদর্শের প্রতি উৎসর্গকৃত ও নিবেদিত এক মহান সত্তা ও নিদর্শন। অছি-এ গাউছুল আজম ও আমিরে মোস্তাজেম যেন আষ্ঠে পৃষ্ঠে বাধা ছিল এবং একজন আরেকজন কে না জানিয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতেন না। অছি-এ গাউছুল আজমের ওফাতের পর আমিরে মোস্তাজেম যা কিছু করতেন তাহা তাঁরই নির্দেশের অনুবলে করতেন। তার ওফাতের পর দরবারের ক্ষমতা, শক্তি সম্পদ নিয়ে অরাজকতা সৃষ্টি হয়ে ছিল তা অত্যান্ত সতা নিষ্ঠার সাথে যৌক্তিক সহকারে সহোদরদের কে নিয়ে যে ধৈর্য্য ও আদর্শ নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন এবং চরম বিপদের সময় যে ভাবে স্থির থেকে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। সর্বাবস্থায় অছি-এ- গাউছুল আজমের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল। আমার যৎকিঞ্চিৎ জীবনে অছি-এ গাউছুল আজমকে দেখেছি এবং জেনেছি তাঁর পূর্ণ ছবি আমি আমীরে মোস্তাজেমের মাঝে পেয়েছি। কোন এক মনিষী বলেছেন "যে হয় সোলতানের বেটা,সে হইবে সোলতানের বৈঠা" শাহাজাদা সৈয়দ মনিরুল হক, সোলতান দেলাওর হোসাইন। মাইজভাণ্ডারীর সারা জীবন তাঁরই নির্মিত তরী শক্ত হাতে বৈঠা নিয়ে পাউছে পাকের ভক্ত জায়েরীনদেরকে কিনারায় পৌছে দিয়াছেন। অছি-এ-গাউছুল আজমের মূল্যবান কিতাব বেলায়তে মোতলাকার সু-নেতৃত্ব ও ধর্ম সাম্য পর্বে উল্লেখ ৭৯-৮০পৃষ্ঠায়। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ, জাতি, সমাজ বা পরিবার নাই যাহারা তাহাদের মধ্যে হইতে একজনকে নেতা বা শাসক হিসাবে মানেনা। যে দেশ জাতি, বা সমাজে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব আছে তাহারা উন্নত নহে; পক্ষান্তরে যাহারা উপযুক্ত নেতৃত্বের অধীন তাহারা উন্নত ও সম্মানিত। উপযুক্ত নেতৃত্ব প্রচ্ছন্নই থেকেতে